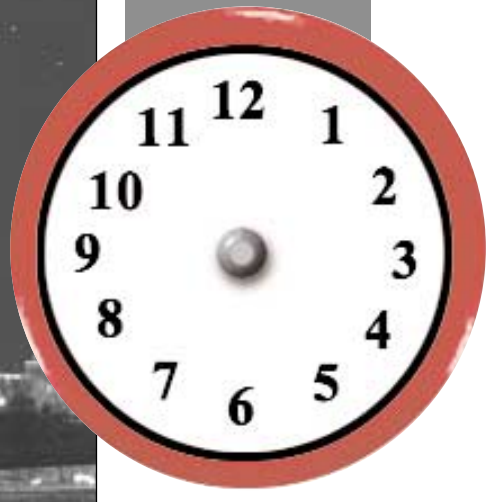

স্পট : প্যারিস

# ‘প্রথম প্রেমের মতো, প্রথম কবিতা এসে বলে, হাত ধরে নিয়ে চলো, অনেক দূরের দেশে’...

লেখা ও ছবি : **সানজিদা শামস্ উর্মি**

২০ জুলাই ২০০২

ভোর ৬টা : মামুর গাড়িতে খাদ্য পানীয় নিয়ে ৩ জনের (মামু, আমি, তরু) যাত্রা শুরু হলো। গাড়ির সিডি প্লেয়ার অন্ করতেই বেজে উঠলো 'Let me take you far away ...a holiday.' সত্যিই হলিডের আবেশ মেখে ফ্রান্সের বিখ্যাত ভার্সেই নগরীর দিকে গাড়ি চলতে শুরু করলো। প্রথমে ভার্সেই, তারপর আইফেল টাওয়ার এবং ল্যুভ মিউজিয়াম।

গাড়ির গতি কখনো ১৪০ কি.মি, কখনো ১৮০ কি.মি আর কখনো বা ২০০ কি.মি প্রতি ঘণ্টায়। পথের দু'ধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মাঝে মাঝে বিমুগ্ধ করে ফেলছিল। বরফ আচ্ছাদিত পাহাড় mont blanc, বয়ে চলা তুষারগলা নদী, mont blanc-এর পেটের ভেতর দিয়ে লম্বা টানেল, আঙুরের বাগান, গমের সোনালি ক্ষেত, দূরের গ্রামের মধ্য থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা চার্চের ঘণ্টা ঘর, সবুজ পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাল টালির স্বপ্নের ঘরবাড়ি, সব সবকিছু এটা অন্যরকম ভালোলাগা ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল মনে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ল আধুনিক কৃষকদের ট্রাক্টর দিয়ে ফসল কাটা, আর কোথাও শুধুই ধু ধু মাঠ।

সকাল ৯.০০ : প্রকৃতি দেখতে দেখতে autoroad (highway)-এর একটা parking-এ গাড়ি থামলো। তেল নেয়া হলো, সেই সঙ্গে আমরাও সকালের নাস্তা করলাম কফি, বনরুটি, কলা। পুনরায় যাত্রা শুরু। ইউরোপের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই autoroad দিয়ে যে কোনো দেশেই যাওয়া যায়। আর যাত্রার ক্লান্তি ঘোচাবার জন্য কিছুদূর পর পর (প্রায় আধা ঘণ্টার ড্রাইভ) আধুনিক পার্কিং এরিয়া। তেলের সঙ্গে সঙ্গে রেস্টুরেন্ট, টয়লেট, বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে Open green space, যেখানে গাছের ছায়ায় কংক্রিটের বসবার জায়গা।

*ল্যুভ মিউজিয়ামের কাঁচের পিরামিড*

বেলা ১২.০০ : পৌঁছালাম বিখ্যাত দেয়াল ঘেরা ভার্সেই নগরীতে।

ফ্রান্সের তৎকালীন রাজা ত্রয়োদশ লুইস (Louis XIII) ভার্সেই এসেছিলেন শিকার করতে এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি এখানে একটি হান্টিং লজ্ তৈরি করেন। পরবর্তীতে তার ছেলে রাজা চতুর্দশ লুইসের (Louis XIV) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। এই প্রাসাদকে ঘিরে আছে অপূর্ব সুন্দর একটি বাগান।

রাজা চতুর্দশ লুইস ভার্সেই প্রাসাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ১৬৮২ সাল থেকে এবং ঐ সময়েই ভার্সেই নগরী পরিণত হয় ফ্রান্সের রাজধানীতে। পরবর্তীতে রাজা পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ লুইসও ভার্সেই হতেই সমস্ত রাজকার্য ও শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ৬ অক্টোবর ১৭৮৯ সালে প্যারিসের কিছু উচ্ছৃংখল জনতা রাজা ষষ্ঠদশ লুইসকে ভার্সেই থেকে প্যারিসে নিয়ে যায়।

শনিবার হওয়াতে ভার্সেই নগরীর প্রধান ফটক পার হতে পারলেও প্রাসাদে ঢোকার জন্য প্রায় ১ কি.মি লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হলো। অবশেষে প্রাসাদে ঢুকতে পারলাম।

বেলা ১২.৪৫ : প্রসাদের ভেতরে ঢোকার পর দেখলাম সারি সারি ঘর একটার পর একটা কোনোটা বর্গাকার, কোন্টা আয়তকার; কোনোটা দিয়ে বাগান দেখা যায়, আর কোনোটা দিয়ে অভ্যন্তরীণ মার্বেল Courtyard দেখা যায়। অপূর্ব কারুকার্যময় আসবাবপত্র, কার্পেট, দেব-দেবতা, রাজা-রানী, নিসর্গের বর্ণময় paintings ঠাসা দেয়াল আর সিলিং (Ceiling) সমৃদ্ধ ঘরগুলোর প্রতিটা যেন এক একটা গল্প নিয়ে বসে আছে।

(i) দ্য কিংস স্টেট অ্যাপার্টমেন্ট (The king's state apartment) : এটি কয়েক দফা remodel করা হয়েছে। ১৬৭১ ও ১৬৮১ সালে পেইন্টার চার্লস লি ব্রুনের (Charles Le Brun) তত্ত্বাবধানে এই অ্যাপার্টমেন্টের সর্বশেষ কাজ হয়েছিল। ব্রুন এখানে ৭টি ড্রইং রুম এমনভাবে ডিজাইন করেছেন যেন মনে হয় গ্রিক আর রোমান পুরাণের সূর্যদেব অ্যাপোলোকে ঘিরে ঘুরছে কতগুলো গ্রহ। রাজা চতুর্দশ লুইসকে অ্যাপোলো দেবতার প্রতীকরূপে বোঝানো হয়েছে। এই ঘরগুলোর এক একটির নামকরণ হয়েছে গ্রিক-রোমান পৌরাণিক দেবতার নামানুসারে। এগুলো যথাক্রমে ড্রইংরুম অব প্লেনটি, ভেনাস (ভালোবাসার দেবী) ড্রইং রুম, মারস্ (যুদ্ধদেব) ড্রইং রুম, প্রধান শয়নকক্ষ তথা মারকারি (ভগবানের দূত) ড্রইং রুম এবং অ্যাপোলো ড্রইং রুম। বাগানের উত্তর দিকে জানালা দেয়া প্রতিটি রুমই ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতো– পানশালা, খেলাধুলা, নাচঘর, বিলিয়ার্ড ইত্যাদি। এখানেই রাজা তার

*ভার্সাই নগরীর দৃষ্টিনন্দন বাগান*

সভাসদবর্গকে অভ্যর্থনা জানাতেন। ১৬৮৪ সাল হতে রাজার জীবদ্দশাতেই প্রাসাদের এ অংশটি বিশেষভাবে রাজার দর্শনার্থী এবং সভাসদবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহার শুরু হয়। এই রুমগুলোর প্রতিটির সিলিং-এর অসম্ভব সুন্দর paintings গুলো painter চার্লস লি ব্রুন ও তার সহযোগী পেইন্টারদের দক্ষতারই প্রমাণ দেয়।

(ii) দ্য হল অব মিররস্ (The hall of mirrors) : the hall of mirrors, the peace drawing room, the war drawing room (প্রতিটি

*সৌন্দর্যের দেবী*

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতায় যথাক্রমে ৭৩ মি., ১০.৫ মি., ১২.৩ মি.) ভার্সেই প্রাসাদের সৌন্দর্যের অনেকটাই ধরে আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বাটে এ কক্ষগুলোর পশ্চিমের জানালা দিয়ে নগরীর অনিন্দ্য সুন্দর বাগানের এক অপূর্ব পারস্পেকটিভ view পাওয়া যায়। স্থপতি জুলস্ হার্ডউন-মানসার্ট (Jules Hardouin-Mansart) এবং চিত্রকর চার্লস লি ব্রুনের তত্ত্বাবধানে ১৬৭৮ ও ১৬৮৬ সালে এ কক্ষগুলো পুনর্বিন্যাস করা হয়। ধনুকাকৃতি সিলিংয়ে (vaulted ceiling) অঙ্কিত চিত্রকর্মগুলোতে রাজা চতুর্দশ লুইসের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে হয়েছে। পুরো কক্ষটাই ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি (Chandelier) দিয়ে সাজানো। আমার তো মনে হলো এটা একটা ঝাড়বাতি ঘর। রাজা তার উপাসনালয়ে যেতে আসতে এ ঘরটিই ব্যবহার করতেন। এই hall of mirror-ই রাজা-রানীর অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যকার passageway হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

পরবর্তীতে এই কক্ষটি বড়সড় কোনো রাজকীয় উৎসব যেমন রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা, রাজসিক বিয়ে, রাজা বা রানীর অভিষেকে ব্যবহৃত হতো।

(iii) দ্য কুইন্স অ্যাপার্টমেন্ট (The queen's apartment) : এটি ৪টি কক্ষ নিয়ে গঠিত। এগুলোও বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথাক্রমে প্রধান শয়নকক্ষ (The state Bed chamber), স্যালুন দে নবেলস্ (Salon des Nobles), রানীর উপকক্ষ (Antechamber) এবং রানীর রক্ষকদের কক্ষ (Queen's Guardroom)। এই কক্ষগুলোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য আরো কিছু ছোট ছোট ঘর ছিল, যেসব ঘরের জানালাগুলো অভ্যন্তরীণ courtyard-এর দিকে।

উত্তরাধিকার সূত্রে এই অ্যাপার্টমেন্টটি বিভিন্ন রানীরা ব্যবহার করেছে। রানীদের বিশাল শয়নকক্ষেই জন্মেছে রাজকীয় শিশুরা।

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ছাপ আছে এই অ্যাপার্টমেন্টে। এর কক্ষগুলোর সিলিংয়েও অপূর্ব চিত্রকর্মের সন্নিবেশ ঘটেছে।

(iv) দ্য হল অব ব্যাটেলস (the hall of battles) : দৈর্ঘ্যে ১২০ মি. এবং প্রস্থে ১৩ মি. একটি লম্বাটে কক্ষ, যা প্যারিসের ল্যুভ মিউজিয়ামের গ্র্যান্ড গ্যালারির আদলে তৈরি।

*ল্যুভ মিউজিয়ামে সারিবদ্ধ মমি*

১৮৩৭ সালে রাজা লুইস ফিলিপ (Louis-Philippe) প্রাসাদের দক্ষিণে দোতলায় অবস্থিত এই মিউজিয়ামটির উদ্বোধন করেন। এখানে ফ্রান্সের সামরিক বিজয়, যুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে ৩৩টি paintings, ৮২টি আবক্ষ সামরিক ভাস্কর্য (military figures) এবং ১৬টি তামার ফলক আছে যার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে সেইসব বীরদের যারা ফ্রান্সের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিকেল ৬.৩০ : গাড়ি পার্কিংয়ে রেখে হেঁটে হেঁটে যে paved areaতে পৌছালাম, আইফেল টাওয়ারের পুরোটা এখান থেকেই পুরোপুরি ক্যামেরার লেন্সে ধরা দেয়। আসলে এজন্যই এই paved areaসহ ফোয়ারা, জলাধার, গাছ-গাছালি নিয়ে একটা landscape design করা হয়েছে। কিন্তু এই বেদী থেকে আইফেল টাওয়ারের পাদদেশে পৌছাতে পৌছাতে লিফট্ বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে মামা, তরু কারোরই নড়ার লক্ষণ না দেখতে আমি রওনা দিলাম, আইফেল টাওয়ারে আমাকে উঠতেই হবে। প্রায় দুই থেকে আড়াই কি.মি. উড়েই গেলাম প্যারিসের বিখ্যাত সীন নদীর ওপর দিয়ে। অবশ্যই নদী না landscape, আমার তখন হুঁশ নেই। ফেরার সময় বুঝেছি। যাই হোক আবার দেড় কি.মি লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট যখন হাতে এলো জানলাম লিফ্ট ১১টা পর্যন্ত খোলা।

*আইফেল টাওয়ার থেকে প্যারিসকে দেখছেন পর্যটকরা*

৭.৩০ : বিশ্বমেলা ১৮৮৯-এর জন্য ফ্রান্স সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় যা হবে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। যেই ভাবা সেই কাজ। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮৮৬ সালে একটি ডিজাইন কম্পিটিশনে (Competition) গুস্তাভ আইফেল (Gustave Eiffel) এবং তার সহযোগীদের দেয়া প্রায় 300m উঁচু ধাতু নির্মিত (metal tower) টাওয়ারটির প্রস্তাব গৃহীত হয়। বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির অমতে ২৬ জানুয়ারি ১৮৮৭ সালে এর কাজ শুরু হয়। টাওয়ারটির বিভিন্ন অংশ আঁকা (প্রায় ১,২০,০০টি) ৭০০টি drawing sheet নিয়ে প্রায় হাজার খানেক শ্রমিক কাজ করেছে অক্লান্তভাবে। প্রায় ২৫ লাখ বল্টু দিয়ে এই ১,২০,০০০টি অংশ যুক্ত হয়েছে। কাজ এগিয়েছে প্রতি মাসে ১৫ মি. উচ্চতা করে। অবশেষে ১৮৮৯-এর ৩০ মার্চ এই টাওয়ারটির উদ্বোধন করা হয়। গুস্তাভ আইফেলের নামানুসারে এর নাম রাখা হয় আইফেল টাওয়ার।

প্রায় ১০,০০০ টন মেটালের এই টাওয়ারটি ভিস্যুয়ালি ভীষণ হাল্কা মনে হয় এর ডিজাইনের কারণে। এই টাওয়ারের তিনটি তলা যথাক্রমে ৫৭ মিটার, ১৫৫ মিটার ও ৩০০ মিটার উচ্চতায়। এই উচ্চতাগুলোতে উঠতে পর্যায়ক্রমে সিঁড়ি বাইতে হয় প্রথমে ৩৬০টি, তারপর ৩৮০টি এবং সবশেষে ১০৬২টি। সৌভাগ্যক্রমে লিফট্ সংযোজিত হয়েছিল টাওয়ার নির্মাণের সঙ্গেই, যার কলকব্জা এখনো সচল।

ফ্রান্সের মহাযুদ্ধের সময় এই টাওয়ারটি রেডিওগ্রাফিতে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানেও এর airwaveকে কাজে লাগাচ্ছে ফ্রান্সের রেডিও-টেলিভিশন এবং সেজন্য টাওয়ারটির উচ্চতা বেড়ে হয়েছে ৩২০.৭৫ মিটার।

৮.০০ : আমরা লিফ্টে করে ৩০০ মি. উচ্চতায় পৌছালাম বিকেল ৮টায়। ইউরোপের সামারগুলোতে সন্ধ্যা হয় ১০টায়। রোদ তখনও চক্‌চক্ করছে, হু হু করে বাতাস বইছে। কেমন যেন শীত শীত করতে লাগলো। রেলিংয়ের বাইরে মেগাসিটি প্যারিসের এরিয়্যাল ভিউ (Arial view) পেলাম আর স্কাই লাইনে (sky line) দেখলাম আকাশ অনেক উপরে উঠে গেছে বড় বড় বিল্ডিং-এর বদৌলতে। ঢাকাকে ওপর থেকে দেখলে দেখা যায় বিল্ডিং, জ্যাম আর কালো ধোঁয়া। আর প্যারিসে বিল্ডিংয়ের পর বিল্ডিং থাকলেও জ্যামহীন রাস্তাঘাট, সাজানো গোছানো landscape, সিন নদীর টলটলে পানিতে river cruise, দূষণমুক্ত আকাশ। একটা খুব Costly রেস্টুরেন্ট আছে এই ৩০০ মি. উচ্চতায়। গুস্তাভ আইফেল আর টমাস আলভা এডিসন (ডামি) গভীর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করছেন দেখলাম।

রাত ১০.৩০ : তিলোত্তমা নগরী প্যারিসের রাস্তার পাশে বসে খাওয়া একটা ব্যাপার– তরু বলছিলো। সত্যিই তাই, দেখলাম প্রতিটি রেস্টুরেন্টের অভ্যন্তর খালি আর রাস্তার পাশে ফুটপাতের ওপর রেস্টুরেন্টের যে উন্মুক্ত স্থান তাতে চেয়ার-টেবিল পাতা এবং অসম্ভব ভিড়। তরুর খায়েশ মেটাতে আমরা ফুটপাতের ধারে খেতে বসে একদিনের জন্য প্যারিসবাসী হতে চেষ্টা করলাম। সেদ্ধ মুরগি, রুটি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, কফি এই দিয়ে রাতের খাবার সারলাম।

১২.০০ : রাত ১২টার শঁজেলিজ দেখে মনে হলো সবে সন্ধ্যা হলো। শঁজেলিজ আসলে প্যারিসের গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা, আমাদের ঢাকা শহরের মানিক মিয়া এভিন্যুর মতো। রাষ্ট্রের বিশেষ দিনগুলোতে এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সম্মানার্থে এখানে কুচকাওয়াজ হয়। এছাড়া শহরের বিখ্যাত সব দোকান, শপিং কমপ্লেক্স, থিয়েটার, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, ব্যাংক,

মোটর-এয়ারলাইন, অফিস ইত্যাদি এ রাস্তার দু'ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকে এর গুরুত্ব আরো বেড়েছে।

শাঁজেলিজ হয়ে হোটেলে ফেরার পথে গাড়ির রিয়্যার ভিউ মিররে দেখলাম পেছনে বিশাল এক কালো কিউবের মাঝে একটা রিফ্লেক্টিভ গ্লাস বসানো। রাতের আকাশের ছায়া পড়েছে তাতে। মামাকে জিজ্ঞাসা করতেই জানলাম ওটা লাশিফঁজ (La Defense)। মামুকে বললাম যেতে চাই। মামু সানন্দে রাজি হলো। তবে কথা হলো, প্রথমে ল্যুভ মিউজিয়াম।


হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কুইজ প্রতিযোগিতা

বিস্তারিত জানতে ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

- আপনি কি একজন স্মার্ট মা?
- আপনার সন্তান কি জিনিয়াস?

**জিতে নিন ফ্রিজ, কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট এবং আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার**


**২১ জুলাই ২০০২**

সকাল ৮.০০ : ঘুম ভাঙতে না চাইলেও তাড়াতাড়ি উঠতে হলো। কারণ, ল্যুভ মিউজিয়ামের ভিড় এড়াতে হবে। হোটেলের সকালের নাস্তা সেরে ৯টার মধ্যে ল্যুভ কম্পাউন্ডে হাজির হলাম। টিকেট কেটে হুড়মুড় করে ঢুকেও গেলাম। তখনও ভিড় ততোটা শুরু হয়নি।

৯.৩০ : ১১৯০-১২০০ সালে ফিলিপ আগস্টে (Philip Auguste) লুপারাতে একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। লুপারাই পরবর্তীতে ল্যুভ (Louvre) নামে পরিচিতি পায়। পঞ্চম চার্লস ১৩৬০ থেকে ১৩৮০ সালে এতে কিছু পরিবর্তন আনেন এবং এই প্যালেসটি পুরোপুরিভাবে পুনর্নির্মিত হয় প্রথম ফ্রসের (Fransois I) এবং উনিশ শতকে। এই চার সময়ের পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারার ছাপ এখানে দেখা যায়। ল্যুভ মিউজিয়ামের নেপোলিয়ন courtyard-এ নির্মিত গ্লাস পিরামিডটি আধুনিক স্থাপত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। গ্র্যান্ড ল্যুভের glass pyramid অংশটি পাবলিক সেকশন, রিসেপশন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বখ্যাত স্থপতি আই.এম পেইয়ের (Ieoh Ming Pei) আর এক বিস্ময়কর অবদান এই glass pyramid। এছাড়া square coutyard, পিয়ের লেকোটসের (Pierre Le Scots) এলিভেশন (elevation), লো মারসিয়ের (Le Mercier) ক্লক প্যাভিলিয়ন এবং ক্লদ পেরল্টের (Claude Perrawlt) পশ্চিম এলিভেশন এই চার সময়ের পরিবর্তনের উদাহরণ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংগ্রহ সমৃদ্ধ এই মিউজিয়ামটি 'আর্টের মক্কা' নামে পরিচিত।

ল্যুভ মিউজিয়াম সমৃদ্ধ হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা থেকে নেয়া বিভিন্ন সভ্যতা যেমন– মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা; ইজিপশিয়ান সভ্যতা; প্রাচীন গ্রিস, এট্রুসকান (etruscan) আর রোমান সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে। যার মধ্যে মাস্তাবা (mastaba–এক ধরনের পিরামিড), স্ফিংকস্ (sphinx), মমি, প্রাচীন শিলালিপি, বিভিন্ন ধরনের জুয়েলারি, মৃৎশিল্প, আসবাবপত্র অন্যতম। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের পৃথিবী বিখ্যাত সব শিল্পকলার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। মধ্যযুগ থেকে রেঁনেসা পর্যন্ত বিভিন্ন decorative arts যেমন– ১৭ থেকে ১৮ শতকের হীরার মুকুট, ১৯ শতকের আসবাবপত্র। তৃতীয় নেপোলিয়নের অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি যেমন আছে এখানে, তেমনি আছে মধ্যযুগের শেষ থেকে শুরু করে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ের ইউরোপিয়ান ভাস্কর্য যা সংগ্রহ করা হয়েছে ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, উত্তর ইউরোপ থেকে। বিশ্বখ্যাত ভাস্কর্য ভেনাস (Hellenic Greek art), মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর 'The dying slave', রোডস্ স্কুলের (Rhodes school) 'the victory of samotrace এর মধ্যে অন্যতম। এখানে ইউরোপিয়ান (ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, জার্মানি, ফ্লেমিশ্, ডাচ ইত্যাদি) চিত্রকলার (painting) এক মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। এদের মধ্যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির (leonardo da Vinci) মোনালিসা, রাফায়েলের (Raphael) পোর্ট্রেট অব জিন ড্যারাগন (Portrait of Jeanne d'Aragon), পিয়ের পল রুবেনসের (Pierre Pawl Rubens) মেরি দ্যু মেডিসিজ (Marie de Medicis, the taking of Juliers), ডোমিনিকস থিওটোক-পাওলাসের (Domenicos Theotocopoulous) 'Christ on the cross' সুবিখ্যাত। এছাড়া আফ্রিকা, এশিয়া, ওশেনিয়া থেকে সংগৃহীত প্রচুর art piecesও আছে। কথায় আছে ১ দিনে লুভ্যের সামান্য একটু অংশ দেখাও সম্ভব নয়, আর আমরা তো সেখানে ক'ঘন্টার অতিথি মাত্র। Information guide দেখে মমি, স্ফিংকহমম, মাস্তাবা, প্যাপাইরাসের প্রাচীন লিপি, Sculpture courtyard, প্রাচীন গ্রীস- রোমান ইজিপশিয়ান সভ্যতার কিছু নিদর্শন দেখে, ভেনাস আর বন্দী দাসকে ছুঁয়ে, মোনালিসার হাসি মেখে, হীরার মুকুট মাথায় পরার স্বপ্ন দেখে, নেপোলিয়নের অ্যাপার্টমেন্ট বুকে করে ঘণ্টা চারেক পরে glass pyramid-এর ভেতর দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। উদ্দেশ্য লাদিফজ্ (La defense)।

*নিপুণ শিল্পকর্ম দেখে মন ভরে যায়*

১.০০: দিনের আলোয় লাদি-ফজ্কে চিনতে পারলাম। রাতের অন্ধকারের কালচে অবয়বটি আসলে মার্বেল পাথরে ঢাকা একটা ঘনকাকৃতি (cube) বিল্ডিং। স্থাপত্য বিদ্যার ছাত্রী থাকাকালীন এই structureটাকে ২/১বার দেখেছি। এটাকে গ্র্যান্ড আর্চ নামে (La Grande Arch) চিনতাম।

আসলে ফ্রান্সের ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একটা অংশ হওয়াতে এটি লাদিফজ্ নাম ধারণ করেছে। প্যারিসের পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত অক্ষ রেখাটি ল্যুভ মিউজিয়াম থেকে শুরু করে ট্রায়ামফাল আর্চ (triumphal arch), শঁজেলিজ, নিউলি ব্রিজের (Neuilly bridge) ওপর দিয়ে এই গ্র্যান্ড আর্চে (La Grande Arche) গিয়ে মিশেছে। তবে এটার ডিজাইন এই অক্ষরেখাকে উন্মুক্ত করেছে। গ্র্যান্ড আর্চের শ্রষ্টা ড্যানিশ স্থপতি জোহান অটো ভন্ স্পার্কেলসনের মতে, গ্র্যান্ড আর্চ হলো একটা উন্মুক্ত কিউব, পৃথিবীর দিকে খোলা একটা জানালা, চলার পথে ছোট্ট একটা বিরতির মধ্যে এক পলকের জন্য তার মাধ্যমেই ভবিষ্যৎকে দেখে নেয়া। এই বিল্ডিংটি যেন রাজধানীর দিকে একটা 'Symbolic gateway'। মার্বেল আর গ্লাস আবৃত এই মনোলিথ্ (monolith) structureটি বিল্ডিং স্থাপত্যের একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। Pure form আর sheer forceকে কাজে লাগিয়ে একটা powerful এবং sophisticated ডিজাইন এই লাদিফজ্।

১৯৮২ সালে 'International Centre for communication'-এর জন্য একটা ডিজাইন Competition-এ ৪২০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীর মধ্যে প্রায় অখ্যাত ড্যানিস স্থপতি জোহান অটো ভন্ স্পার্কেলসনের (১৯২৯-১৯৮৭) La Defense নির্বাচিত হয়। ১২ জন স্থপতি, লক্ষাধিক drawings, প্রায় ২০০০ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ানের নিরলস পরিশ্রমে ১৯৮৯ সালের জুলাইয়ে এটি উদ্বোধন করা হয়। অবশেষে ২৭ আগস্ট ১৯৮৯ সালে এটির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রায় ঘনাকৃতির এই বিল্ডিংটি ১০৮ মি. চওড়া, ১১০ মি. উঁচু এবং গভীরতা ১১২ মি. Roof terraceসহ ground coverage প্রায় ৩ একর। মোট খরচ হয়েছে ২.৬ শ'ত কোটি ফ্রাঙ্ক। ২.৪৭ একর মার্বেল ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। প্রায় ৩০০ হাজার টনের এই structureটিকে বসানো হয়েছে ১২টি কংক্রিট পিলারের ওপর যার প্রতিটির bearing capacity হলো আইফেল টাওয়ারের ৩ গুণ। আর double tower-এ প্রায় ২০০০ employee-র জন্য ৮৭,০০০ sq.m. অফিস স্পেস সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক হাজার দর্শনার্থীর সমাবেশ ঘটেছে এখানে, যার মধ্যে আমরাও ৩ জন।

আশির দশকের এ monument কে ঘিরে স্থপতি অটো ভন্ যে স্বপ্ন বুনেছিলেন 'a symbol of hope that in the future men will be able to meet here freely'– তা বাস্তব রূপ নিয়েছে।

বেলা ৩.৩০ : গ্র্যান্ড আর্চের সামনের open paved courtyard-কে ঘিরে আরো অসংখ্য building আছে। আছে রেস্টুরেন্টও। দুপুরে খাবার খেলাম ওখানেই ম্যাকডোনাল্ডস্ (Macdonald's)। তারপর প্যারিসের ঐতিহাসিক structure আর আধুনিক structure-এর তুলনা করতে করতেই গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে বেজে ওঠে মামুর প্রিয় ব্যান্ড মাইলসের- 'প্রথম প্রেমের মতো/প্রথম কবিতা এসে বলে হাত/ ধরে নিয়ে চলো/ অনেক দূরের দেশে...'। জেনেভার দিকে ছুটে চললাম আমরা, পেছনে পড়ে রইলো দূরের দেশের ভার্সাই নগরী, আইফেল টাওয়ার, ল্যুভ মিউজিয়াম, রাতের প্যারিস আর লাদিফজ্।